নাগরিক সমাজ, বাস্তব রাজনীতি ও মতাদর্শ : কিছু প্রশ্ন

সমরেশ মিত্র

পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবন সাম্প্রতিক নানা ঘটনায় উথাল - পাথাল। সেই প্রেক্ষিতে আবার নতুন করে সামনে এসে হাজির হয়েছে রাজনৈতিক দলের আওতার বাইরে গড়ে ওঠা সামাজিক উদ্যোগের বিষয়টিও। নানা জন এই উদ্যোগের নানা নাম দিচ্ছেন—সুশীল সমাজ থেকে নাগরিক সমাজ।

ভারত তথা পশ্চিমবাংলার ইতিহাস সামাজিক - রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া— তীব্র প্রতিক্রিয়া— নতুন কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিরোধী রাজনৈতিক দল এই উদ্যোগকে দুহাত তুলে স্বাগতও জানায়। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের সময় হিন্দু - চেতনার অঙ্কুরোদগম কে অস্বীকার করবে? কিন্তু জাতির জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঐ আন্দোলনের ভূমিকাকেও তো অস্বীকার করা যাবে না। আমূল পরিবর্তনকামী কোনও শক্তির অনুপস্থিতিতে এমন স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ কি তখনকার সামাজিক - রাজনৈতিক চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না? হিজলি জেলে গুলিবর্ষণের ফলে যখন কিছু দেশপ্রেমিক নিহত হন, তখন আমূল পরিবর্তনকামী শক্তির প্রতিভূ হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি ভারত তথা বাংলায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের উদ্যোগকে অনেক ছাপিয়ে উঠে বৃটিশ শাসনের ঐ দমবন্ধ করা অবস্থায় দেশের হয়ে, জাতির হয়ে প্রবল প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন জমিদারবাড়ির ছেলে রবীন্দ্রনাথ— সারা দেশের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তা অনুঘটকের কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীভিত্তি, তাঁর অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের কথা ভেবে কটাক্ষ করার আগে এটা মানতে হবে যে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় 'ইংরেজের গণতন্ত্রপ্রেমী' রবীন্দ্রনাথই নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। আবার লাহোর জেলের অনশনের ফলে মৃত যতীন দাশের মৃতদেহ যখন কলকাতা শহরে এসে পৌঁছায় তখন সেই শববাহী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেদিন সারা কলকাতার নানা অর্থনৈতিক বর্গের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে ধিক্কার জানায়। আজও সারা বাংলার বহু অঞ্চলে নেতাজির জন্মদিবস স্মরণ করে শঙ্খধ্বনি হয়। কথাটা হলো কোন্ কোন্ মানুষ এসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনাবলীতে জড়িয়ে পড়ছে তা নয়, কোন্ ঘটনায় তারা জড়িয়ে পড়ছে সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয়।

জনগণের স্বতোৎসারিত উদ্যোগ সর্বদাই শাসকদের চক্ষুশূল— তাদের কাছে আতঙ্কের বার্তাবাহী। ফলে এই উদ্যোগ চাপা দেওয়ার জন্য তাদের দ্বিবিধ কর্মপদ্ধতি দেখা যায় প্রথমত তারা এই উদ্যোগকে খাটো করে দেখিয়ে তার ধার লঘু করতে চায়, ক্ষেত্র বিশেষে এই উদ্যোগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে খর্ব করার জন্য এই উদ্যোগকে তারা বেদখল করে, বা তার পাল্টা উদ্যোগ তৈরি ক'রে উদ্যোগটির অভিমুখ বিপথগামী করার প্রয়াস নেয়।

১৯৪৭ -এর পর নানা উদ্যেগ বিচার করে আমরা এই বিষয়টিকে বুঝতে পারি।' ৫০-এর দশকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলন, ১৯৫৯-র খাদ্য আন্দোলনের নৃশংস দমন, ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন, এর প্রত্যেকটির পেছনে ছিল সাধারণ নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং প্রথম দিকে নেতৃত্বদানও। রাজনৈতিক নেতা বা দলের ছত্রছায়ায় যাওয়ার আগে আন্দোলনের রূপ, দাবি এবং প্রকরণ ছিল অন্য জাতের জরুরি অবস্থার সময় জনবিরোধী বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত বহু ব্যক্তি বা সংগঠনের অনেকেই কারাবরণ করেন এবং পরে জরুরি অবস্থায় অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রেও তাদের ইতিবাচক ভূমিকায় দেখা যায়। অথচ আমূল সমাজ পরিবর্তনকারী বলে পরিচিত প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি।

নাগরিক সমাজ ও বাস্তব রাজনীতি

এই প্রেক্ষিতে আমরা নাগরিক সমাজ এবং বাস্তব রাজনীতির বিষয়টি আলোচনা করতে পারি। নাগরিক সমাজ বলতে আমরা কোনো সমসত্ত্ব পদার্থ বোঝাচ্ছি না— বরং নাগরিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো তার বিভিন্নতা, তার বৈচিত্র্য। সময়বিশেষে এটাই তার দুর্বলতা, আবার এটাই তার জোরের জায়গা। নাগরিক সমাজের কোনো একমুখী দূরবর্তী লক্ষ্য নেই, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে যাত্রার দায় নেই। তাদের অনুচ্চারিত বিবৃতি হলো— 'আজ রেখে যাই আজকেরই বিক্ষোভ'। নাগরিক সমাজে সামিল বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি বিভিন্ন অর্থনৈতিক বর্গের মানুষ। নানান মানুষ নানান টানে একটি বা কয়েকটি বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, সমাজের অন্য ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকেই পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করেন। সাম্প্রতিক নন্দীগ্রাম কান্ডে দেখা গেল গণতন্ত্রের প্রশ্নে, কৃষকের অধিকারের প্রশ্নে যে প্রতিবাদী লেখকরা বিক্ষোভ জানাচ্ছেন, সরকারি তকমা ছুঁড়ে দিচ্ছেন, কিছুদিন আগেই এই বই নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন পরস্পরের বিপরীত অবস্থানে। রাজনৈতিক শক্তিগুলি আবার নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া বিচারের সময় তা সরকারবিরোধী না সরকারপক্ষীয়, এমন অতি-সরলীকরণ করে থাকেন—বিচারের পদ্ধতি হিসাবে যা একপেশে। ভারত তথা বাংলার পরম্পরাই হলো সামাজিক আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য, সহায়তা করার জন্য সহায়ক সমিতি গঠন করা। বন্যা - খরা- দুর্ভিক্ষ, জেল - হাজতে হত্যা, কৃষক - শ্রমিক বিদ্রোহ, সবকিছুর জন্যই নাগরিক সমাজ সহায়ক সমিতি গঠন ক'রে সামাজিক আন্দোলনে মদত দিয়েছে। ইংরেজ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ রোধে গঠিত হয়েছিল পিপলস রিলিফ কমিটি, যা আজ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল কুক্ষিগত করে নিয়েছে। কুক্ষিগত করার কারণ সংগঠনটির সামাজিক মান্যতা। সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে নাগরিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধেতা করার জন্য গঠিত হয়েছিল অনেক নাগরিক উদ্যোগ। সাম্প্রতিক কালে বামফ্রন্টের আমলেও গঠিত হয়েছে বামফ্রন্টের জেলে অগণতান্ত্রিক ভাবে আটকে রাখা, বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার বন্ধের জন্য সহায়ক সমিতির। অদূর অতীতে নকশালবাড়িতে কৃষক হত্যার বিরুদ্ধে, কৃষকদের সমর্থনে, গঠিত হয়েছিল একটি নাগরিক সহায়তা সমিতি। বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের সহায়তা, তাদের ভাতা দেওয়ার দাবিতে, রুগ্ন কারকানার পুনরুজ্জীবনের দাবিতে তৈরি হয়েছে নাগরিক মঞ্চ। আবার সাম্প্রতিক নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের ঘটনায় সরকারি সন্ত্রাসে অত্যাচারিত নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য একাধিক নাগরিক সংগঠন, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের খোলামেলা জমায়েত তৈরি হয়েছে। একদল কর্মী তো নন্দীগ্রামে অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রও চালিয়ে আসছেন। কোন্ রাজনৈতিক দল এই সমস্ত উদ্যোগকে জনবিরোধী উদ্যোগ আখ্যা দেবেন!

উপরোক্ত প্রায় সব উদ্যোগই শুধু ত্রাণ নিয়ে নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ান নি, পাশাপাশি তাঁরা সরকারের সমালোচনা করেছেন, সরকারের অন্যায় - অত্যাচারের বিষয়টি মানুষের গোচরে এনেছেন, জমায়ত তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করা নাগরিক সমাজের আন্দোলনের ক্ষমতা বা এক্তিয়ারের

বাইরে হলেও সত্যিকারের কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এ ধরনের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরিতে সাহায্য করতে পারে

জটিলতা উপস্থিত হয় যখন বাস্তব রাজনীতি এবং ন্যায়নীতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ন্যায়নীতির জন্য প্রয়োজন সরকারের নন্দীগ্রাম নীতির তীব্র বিরোধিতা করা। কিন্তু মুশকিল হয় যখন ধরুন হিন্দী ভাষায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আপনি সামিল থাকেন, যেখানে এই সরকার আপনার পাশে, আপনার মদতদাতা। তখন অন্যদের তুলনায় আপনার সরকার বিরোধিতার ধার অনেকটাই ভোঁতা হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

নাগরিক সমাজের অর্থাৎ নাগরিকরা যে পেশাগত অবস্থান থেকে, সামাজিক অবস্থান থেকে সামাজিক কোনো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, যেখান থেকে তাঁরা এই বাস্তব রাজনীতি করছেন, সেটা বিশ্লেষণ করলে সামাজিক বিষয়ে নাগরিক সমাজের ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি একটু স্পষ্ট হতে পারে। আজকের এই নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশ বিদ্যমান সমস্ত রাজনৈতিক দল, তাদের সংগঠন, তাঁদের কর্মপ্রণালীতে আস্থা হারিয়েছেন, সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। এর পেছনে নানা কারণের মধ্যে যে বিষয়টি দিয়ে নাগরিক সমাজ যথেষ্ট স্পষ্টভাষায় সরব তা হলো বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলির দ্বিচারিতার প্রতি তাঁদের অনীহা। দ্বিচারিতা বলতে তাঁরা যা বলেন তা করেন না। তাঁরা নিজেরা যে কাজ করেন বা অনতি-অতীতে করেছেন, সে কাজই অন্য কেউ করলে তার নিন্দামন্দ করে থাকেন। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় দেখা যাচ্ছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠনের উপস্থিতি নিয়ে শাসক বামফ্রন্টের বড় তরফ সহ সব শরিকদের মত ছিল যে বামপন্থী শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আন্দোলনকারীরা এমনকি সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে, এবং এ কাজ অবশ্যই অতি নিন্দনীয়। এই নিন্দার সময় তাঁরা সুবিধাজনকভাবে বিস্মৃত হন যে তাঁরাই অতীতে কংগ্রেস শাসনকে হাটানোর জন্য কেরালার মুসলিম লিগ, হরিয়ানায় তৎকালীন জনসংঘ, অনতি-অতীতে বিজেপি-র সঙ্গে, হাত মিলিয়েছেন। বর্তমানেও তাঁরা কেরালায় খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছেন, তসলিমা ইস্যুতে মুসলিম মৌলবাদের তোষণ করে চলেছেন। এসবে বামফ্রন্ট কোনও দ্বিচারিতা দেখতে পান না, অথচ নাগরিক সমাজকে কটাক্ষের সময় এই প্রশ্নটিকে তাঁরা সামনে নিয়ে আসেন।

নাগরিক সমাজের নন্দীগ্রাম - উদ্যোগ নিয়ে আর একটি প্রশ্নকে ঘিরে সিপিএম পক্ষ বারবার শুধু কটাক্ষ নয়, আক্রমণ করছেন। প্রশ্নটি তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে। যে আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেসের উপস্থিতি রয়েছে, তার পাশে দাঁড়ানোর প্রবল নিন্দা করছেন তাঁরা, যদিও অতীতে বাংলা কংগ্রেস বা জনতা দলের সঙ্গে তাঁদের একসঙ্গে পথ চলার ইতিহাস আছে, এই মুহূর্তে তাঁরা কেন্দ্রে বিশ্বায়নের পক্ষে দাঁড়ানো কংগ্রেস সরকারের পাশে, কংগ্রেস সমর্থনেই তাঁদের দলের লোক লোকসভার অধ্যক্ষ। বামফ্রন্টের শরিক থাকা সিপিআই তো জরুরি অবস্থার সমর্থনকারী ছিল। কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকারে সিপিআই -এর মন্ত্রীও ছিল। এ সমস্ত ক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে তাঁরা হাত মিলিয়েছেন, তাঁদের কেউই আমূল সমাজ পরিবর্তনকারী বলে স্বীকৃত নন, বরং স্থিতাবস্থার প্রহরী।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ে সংসদের বাইরে, তাঁদের পত্রপত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের শাসক - বামপন্থীরা অতি সরব, অথচ সেই একই ভাবে, সেই একই আইনের সুযোগ নিয়ে যখন বামন্ট সরকার সেই একই ক্ষেত্রের কয়েকটিতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য উদ্বাহু নৃত্য শুরু করেন, তখন নাগরিক সমাজের কাছে তা প্রবল দ্বিচারিতা বলে প্রতিভাত হয়, কিন্তু শাসক বামপন্থী দলের কাছে তা সঠিক, সমালোচনার উর্ধ্বে মনে হয়— তার বিরোধিতা হয়ে যায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল।

নাগরিক সমাজ ও দক্ষিণপন্থা

বাস্তব রাজনীতি নাগরিক সমাজের বশে নয়। আর এখানেই ভূমিকা নেয় সংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলি। এটা নতুন কিছু নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন পেশাগত সংগঠনগুলি, ট্রেড ইউনিয়নগুলি এক বা অন্য সংগঠনের লেজুড়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে তো একাট ক্লাব বা একটা বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি দখল করার জন্যও রাজনৈতিক দলগত প্রতিযোগিতা চলে। নাগরিক সমাজের বর্তমান আন্দোলনও এর থেকে মুক্ত নয়। দেখা যাচ্ছে নাগরিকের ছদ্মবেশে নাগরিক সমাজের মান্যতার আড়ালে তাদের অতীত ও বর্তমান কুকীর্তি গোপন করে আসর মাত করতে চাইছে, আন্দোলনকে কব্জা করতে চাইতে কিছু রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী। নির্বাচনী রাজনীতির হিসাবেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ৫০ শতাংশের মধ্যে পড়ে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আপাতত - ক্ষমতাচ্যুত অংশটি, আবার রয়েছে আপাতত সংখ্যালঘু, সংসদীয় বামদের উল্টোরথযাত্রা বিরোধী বাম শক্তিও, স্বভাবতই নাগরিক সমাজেও এই রাজনৈতিক বিভাজনের প্রভাব পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলগুলির চর্চাকে বামপন্থার একটা মডেল ধরে নিয়ে সেই আদর্শের দ্বিচারিতা, সীমাবদ্ধতা, স্ববিরোধিতাকে উপজীব্য ক'রে নাগরিক সমাজ একটা পাল্টা ঘরানার সন্ধান করেছে। আবার ঠিক এই বিন্দু থেকেই দক্ষিণপন্থীরা সর্বতোভাবে বামপন্থার বিরোধিতা করার সুযোগ করে নিচ্ছেন। অন্য দিকে যারা বামপন্থার প্রতি আস্থাশীল তাঁরা ঘটনার একটা বামপন্থী ব্যাখ্যা হাজির করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। বর্তমানে বাস্তব রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই দুই বিপরীতমুখী শক্তি আপাতভাবে হলেও একটিই মঞ্চে উপস্থিত। দু'দলের অ্যাজেন্ডা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি তাৎক্ষণিক ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের জন্য তাঁরা এক জায়গায়, অনেক সময় একই মঞ্চে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সামাজিকভাবে বর্তমানে দক্ষিণপন্থী শক্তিটি অনেক জোরদার।

অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে একটা বাংলা দৈনিক এই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনায় তাদের গ্রাহক সংখ্যা অবিশ্বাস্যরকম বাড়িয়েছে। নাগরিক সমাজে তাদের চাহিদা বেড়েছে, কারণ এই বিষয়ে জানবার চাহিদা বেড়েছে। সেই পত্রিকায় শাসকদলের জনবিরোধী নীতির নিন্দার পাশাপাশি বিশ্বায়নের মুখোশ খুলে দেওয়ার কাজটি করেছেন নাগরিক সমাজের কিছু প্রতিনিধিরা। আবার এই সুযোগে কেউ কেউ ঐ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অতীতের কংগ্রেস জমানাকে প্রগতিশীল, দক্ষ, সুশাসন হিসাবে বর্ণনা করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, বা সাধারণভাবে কমিউনিজম নিন্দায় ব্রতী হয়েছেন। এটি চিন্তার বিষয়, কারণ নাগরিক সমাজেএ নিয়ে প্রয়োজনায় প্রতর্ক যথেষ্ট মাত্রায় হচ্ছে না।

মতাদর্শ ও বামপন্থা

প্রশ্ন হলো, কেন এমন হচ্ছে? বামপন্থা যখন মতাদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে কেবলমাত্র তুচ্ছ স্বার্থচালিত একটি অতিকায় প্রৌঢ়ে পর্যবসিত হয়, তখন এমনটাই হয়, শাসক বামপন্থীরা যখন নিজেদের রাজত্ব বাঁচানোর তাগিদে অতীতের অত্যাচারী শাসকদেরও দরাজ প্রশংসাপত্র দেন, বর্তমান ও অতীতের গণআন্দোলনকে ভুল বলেন, তখন যদি সমাজের এক অংশ সেই সূত্র ধরে দক্ষিণপন্থার উত্থানের স্বপ্ন দেখেন,

তার দায় কেন নাগরিক সমাজের উপর বর্তাবে? বামফ্রন্ট সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে নাগরিক সমাজ সরব, তাঁদের যদি তৃণমূল - মাওবাদী বলা হয়, তবে যাঁরা নন্দীগ্রামে পুলিসের মৃত্যুতে অশ্রুপাত করছেন বা পুলিশের কর্তব্যপরায়ণতার জয়গান করছেন (যেন এই পুলিশই সিপিআই এম -এর ১২০০ কর্মীকে খুন করেনি) তাদের কেন স্থিতাবস্থার দালাল, এই 'মানুষখেকো ব্যবস্থার' চৌখস সমর্থক বলা হবে না, তার জবাব পাওয়ার প্রশ্নটি না হয় মহকালের জন্য নির্দিষ্ট রইলো।

বস্তুত অতীতে কংগ্রেস সরকার যেমন তার জনবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ - তোষণ নীতি গ্রহণ করার ফলে এই বাংলার বিরাট নিম্নবিত্ত - নিম্নবর্ণ এবং মধ্যমবর্গের এক বিরাট অংশকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, যার ফায়দা নিয়েছে আজকের সংসদীয় 'বামপন্থী' দলগুলি, বর্তমানে সেই ক্ষমতাসীন দলগুলির অনুসৃত নীতিই আবার অতীতের সেই বর্গভিত্তিক ঐক্যকে ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তুমি কোন্ দলের লোক সে কথা নয়, তুমি টাটা - সালিমের পক্ষে, না সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষক-জনতার পক্ষে, বড় পুঁজির পক্ষে, না মেহনতি মানুষের অধিকারের পক্ষে; সেই প্রশ্নটি কিন্তু সামনে চলে আসছে। আর মেহনতি মানুষের সংগ্রামের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের উত্থানও সেই প্রশ্নটিকে সামনে আনার ক্ষেত্রে অনেকটাই সাহায্য করছে। নাগরিক সমাজের বর্তমান উত্থান যদি আরও বেশি বেশি করে সাম্রাজ্যবাদ - বিরোধী, বিশ্বায়ন - বিরোধী রূপ গ্রহণ করে, তবে নাগরিক সমাজের অন্তর্গত দক্ষিণ পন্থী অংশটি অতীতের বাংলা কংগ্রেসের মতোই শাসকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, জনবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করবে— এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি, বা ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট—কেউই চায় না যে এমন একটা মেরুকরণ ঘটুক, তারা চাইছে নাগরিক সমাজের উত্থানের রাশটি থাকুক বিশ্বায়নের সমর্থক শক্তিগুলির হাতে। অথবা নাগরিক শক্তি হোক নিশ্চুপ, রাজনৈতিক বিতন্ডা থাকুক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হাতে, নাগরিক সমাজ বিভাজিত থাকুক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে।

বামপন্থী মতাদর্শের ঘাটতি চিরকালই দক্ষিণপন্থী শক্তির সহায়ক। জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের দ্বিচারিতা হিটলারের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সিপিআইএম-এর মদতে রাষ্ট্রপতি হয়ে ভি ভি গিরি সিন্ডিকেট - ইন্ডিকেট বিরোধে ইন্দিরাকে জয়ী করেন, সিপিআই-এর ইন্দিরা প্রেম ইন্দিরার চামুন্ডায় রূপান্তরের সময় তাঁর সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। বর্তমানে বামপন্থী সাংসদদের ঘাড়ে ভর করে মনমোহনী বিষের বাঁশির সুর আমরা অহরহ শুনছি। মতাদর্শের ভিত্তিতে আর একবার বিচার করার দাবি নিয়েই নাগরিক সমাজ আজ বামপন্থার কাছে, তাদের মতাদর্শের কাছে উপস্থিত। এই বিষয়টিকে তুচ্ছতায় পর্যবসিত না করে হিম্মতের সঙ্গে প্রকৃত বামপন্থী মতাদর্শের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট সময় এটিই।

বামপন্থার মতাদর্শ

প্রতিষ্ঠিত বাম ও প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ—এই দুই মেরুর মোটা দাগের বিভাজনের মধ্যে আরও অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর রয়ে গেছে, যাদের মোটেই অবহেলা করা যাবে না। একদল হলেন চলতি বামফ্রন্টের দলগুলির বা গণসংগঠনের সদস্য বা কর্মী, অথবা সমর্থক, অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাই ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে বামফ্রন্টের বহু নীতির বিরোধী। পার্টি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকায়, বা পার্টি বিরোধী প্রমাণিত হওয়ার ভয়ে অথবা মমতার হাত শক্ত করার আতঙ্গে তারা বাইরে বিরোধিতা প্রকাশ করছেন না। তাদের অনেকেই 'অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম'-এ বিশ্বাসী। তাদের ইতি-উতি প্রকাশ দেখা যায় কখনো রাজ্যকমিটি - জেলাকমিটিতে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলার মধ্য দিয়ে, কখনো বা নাগরিক সমাজ আহূত কোনও কর্মসূচিতে তাদের অনতি - উচ্চকিত যোগদান বা ত্রাণে অর্থদান বা নাগরিক সমাজের আলাপচারিতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে, আবার কখনো প্রকাশ্যে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীতে নাম না লেখানোর মতো পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। এদের সংখ্যা কত তা নিয়ে কল্পনা অর্থহীন, এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জোর কতখানি তা অজানা, জনগণের সংগ্রামে প্রতি এদের আত্মনিবেদন কতটা তাও জানা নেই। এই অংশটিকে যদি আজ ইতিহাসের দাবি মেটাতে হয়, যদি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে না চান তাঁরা, তাহলে তঁদেরে প্রকাশ্যে সরব ও কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। নাগরিক সমাজের দুর্বলতা ও ভুলগুলিকে সমালোচনা করতে হলে তার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তাঁদের, শীতঘুম ছেড়ে রাজপথে নামতে হবে।

বাকি রইলেন সংসদ - সর্বস্ব রাজনীতির বাইরের বামপন্থীরা। এঁরা নাগরিক সমাজে এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে, এই সর্বব্যাপী আন্দোলন - বিরোধিতার বাতাবরণেও আন্দোলনের বামপন্থী ধারার ক্ষীয়মান ধারাটিকে প্রজ্জ্বলিত রাখার প্রয়াসে রত। এঁদের একাংশ এই নাগরিক সমাজের আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের মেলে ধরার প্রয়াস করছেন। বহুধাবিভক্ত মতাদর্শের আঙ্গিনায় বারো ঘর - এক উঠান এই গোষ্ঠীগুলি কেউ কেউ নাগরিক সমাজকেই সমাজ পরিবর্তনের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন (এবং অতীতের মতোই প্রত্যাখ্যাত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন), কেউ আবার নাগরিক সমাজের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের অস্তিত্ব দেখে হেঁসেল আলাদা করছেন, আবার কেউ কেউ আবার দক্ষিণপন্থীদের সামর্থ্য ও জনসংযোগের কথা বিচার করে তাঁদের সঙ্গেই ভিড়ে গেছেন। শেষোক্তরা নিজেদের অজান্তেই দক্ষিণপন্থার উত্থানে মদত দিয়ে ফেলছেন, তাঁদের চৈতন্যে এ সত্য অনুপস্থিত যে পশ্চিমবঙ্গে মেকি বামপন্থার বিকল্প সঠিক বাম, সংগ্রামী বাম, প্রমাণিত দক্ষিণপন্থা নয়।

সব মিলিয়ে নাগরিক সমাজের এই উত্থানে একসঙ্গে বেকায়দায় পড়েছে সংসদ - সর্বস্ব ও সংসদ - বহির্ভূত বাম এবং ধ্রুপদী ঘরানার দক্ষিণপন্থা। মনমোহনের নেতৃত্বে নব্য দক্ষিণপন্থা, প্রকাশ কারাতের নেতৃত্বে নব্য বামপন্থার সঙ্গে এক মসৃণ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ, তাদের মিথোজীবী অস্তিত্ব আপাতত পরস্পরকে কিছুদিন রক্ষাকবচ যোগাবে। কিন্তু সংসদ - বহির্ভূত বামরা চাপে পড়েছেন উল্টো দিক দিয়ে। বিষয় - বিষয়ীর দ্বন্দ্বের কথা বলে, জনগণ প্রস্তুত নয় এমন ধারণার উপর দাঁড়িয়ে যে রাজনৈতিক কার্যক্রম তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, এক সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কান্ড তাঁদের সেই কার্যক্রমকে প্রায় অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। মানুষের এই ক্ষোভকে কেমন করে ভাষা দেবেন, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ মানুষদের কাছে কেমন করে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দেবেন, তাঁদের সংগঠিত করবেন সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে, সেকথা তাঁদের অজানা। আবার যারা ভারত তথা বাংলার কোণে দাবানল দেখছিলেন, তাঁদেরও জনগণের তাঁদের প্রতি অনীহার কারণ খোঁজার দিন সমাগত। আসুন, আমরা সবাই মিলে একবার আকাশের পরিবর্তে সামনের পায়ের তলার মাটির দিকে তাকাই— ''মানুষের হাত ধরে, সে কিছু বলতে চায়।''